প্রাণঘাতী বজ্রপাত: সচেতনতা ও আগাম সতর্কতা

যেসব ঘটনা মানুষের স্বাভাবিক জীবন ধারাকে ব্যাহত করে মানুষের সম্পদ ও পরিবেশের মারাত্মক ক্ষতি সাধন করে এবং যার জন্য আক্রান্ত জনগোষ্ঠীকে জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে ব্যতিক্রমধর্মী প্রচেষ্টার মাধ্যমে মোকাবিলা করতে হয়, তাদের দুর্যোগ বলে। আর প্রাকৃতিক কারণে সৃষ্ট দুর্যোগকে প্রাকৃতিক দুর্যোগ বলা হয়। বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য প্রাকৃতিক দুর্যোগ হলো – অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, খরা, ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, নদী ভাঙন, ভূমিকম্প, বজ্রপাত, ইত্যাদি। বজ্রপাত হলো মেঘের মধ্যে বা মেঘ থেকে ভূমি পর্যন্ত সৃষ্ট বৈদ্যুতিক চার্জের এক ধরনের নির্গমন। যখন মেঘে থাকা ধনাত্মক ও ঋণাত্মক চার্জের পরিমাণ বেশি হয়ে যায়, তখন তাদের মধ্যে বা মেঘের নিচের ভূমির সাথে চার্জের সংঘর্ষ হয়। এই সংঘর্ষের ফলে আলোকরশ্মি ও শব্দের সৃষ্টি হয়, যা আমরা আলো ঝলকানি ও বিকট শব্দ হিসেবে শুনতে পাই।

বাংলাদেশে বজ্রপাতের মূল কারণ দেশটির ভৌগোলিক অবস্থান। কারণ, বাংলাদেশের একদিকে বঙ্গোপসাগর, এরপরই ভারত মহাসাগর। সেখান থেকে গরম আর আর্দ্র বাতাস আসছে। আবার উত্তরে রয়েছে পাহাড়ি এলাকা, কিছু দূরেই হিমালয় রয়েছে, যেখান থেকে ঠান্ডা বাতাস ঢুকছে। এই দুই বাতাসের সংমিশ্রণে বজ্র মেঘ তৈরি হয় এবং এসব মেঘের সাথে মেঘের ঘর্ষণে বজ্রপাত হয়। বাংলাদেশে উত্তরাঞ্চল এবং উত্তর পশ্চিমাঞ্চল বজ্রপাতপ্রবণ এলাকাগুলোর অন্যতম। গ্রীষ্মকালে এ অঞ্চলে তাপমাত্রা বেশি থাকায় এ পরিস্থিতির তৈরি হয়। আবহাওয়াবিদদের মতে, যেসব এলাকায় গ্রীষ্মকালে তাপমাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি থাকে সেসব এলাকায় যে মেঘের সৃষ্টি হয়, সেখান থেকেই বজ্রপাতের সম্ভাবনা থাকে। তাপমাত্রা এক ডিগ্রি বাড়লে বজ্রপাতের সম্ভাবনা ১০ শতাংশ বেড়ে যায়। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বাংলাদেশ ঘন ঘন বজ্রপাতজনিত দুর্যোগের ঝুঁকিতে রয়েছে। লম্বা গাছ কেটে ফেলায় গ্রামীণ এলাকায় বজ্রপাতের ঝুঁকি আরও বেড়েছে। গাছ কেটে ফেলার ফলে প্রাকৃতিকভাবে বজ্রপাত থেকে সুরক্ষা হ্রাস পেয়েছে ও মানুষের জন্য ঝুঁকি বেড়েছে।

বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর বলছে, প্রাক-বর্ষাকাল অর্থাৎ, মার্চ থেকে মে মাসে দেশে ৩৮ শতাংশ বজ্রঝড় হয়। বর্ষা অর্থাৎ, জুন থেকে সেপ্টেম্বর এই চার মাসে ৫১ শতাংশ বজ্রঝড় হয়। বাংলাদেশে প্রতিবছর

রোধে আগাম সতর্কতা ও সচেতনতার ওপর জোর দেওয়া হচ্ছে আগাম সতর্কতা প্রদান সম্পর্কে সচেতনতা তৈরিতে গার্লস গাইড, বয়জ স্কাউট, রেড ক্রস, ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কমিটির স্বেচ্ছাসেবীসহ বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাকে কাজে লাগানো যায়। তাদের প্রশিক্ষণ দিয়ে বজ্রপাতসহ বিভিন্ন দুর্যোগ সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করার কাজে সম্পৃক্ত করা গেলে সাধারণ মানুষের কাছে দ্রুত বজ্রপাতের তথ্য পৌঁছানো সম্ভব হবে। বজ্রপাত থেকে নিরাপদ থাকতে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় বজ্রপাতের সময় করণীয় সম্পর্কে সুপারিশমালা তৈরি করেছে। বজ্রপাতের সময় তা অনুসরণ করলে অনেক বিপদ থেকে নিরাপদ থাকা যাবে। তাই, বজ্রপাত থেকে নিরাপদ থাকতে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সুপারিশমালা মানা খুব জরুরি।

এপ্রিল-জুন মাসে বজ্রবৃষ্টি বেশি হয়; বজ্রপাতের সময়সীমা সাধারণত ৩০-৪৫ মিনিট স্থায়ী হয়। এ সময়টুকু ঘরে অবস্থান করতে হবে। ঘন কালো মেঘ দেখা দিলে ঘরের বাহিরে না যাওয়া; অতি জরুরি প্রয়োজনের ক্ষেত্রে রবারের জুতা পড়ে বাইরে বের হওয়া। বজ্রপাতের সময় খোলা জায়গা, খোলা মাঠ অথবা উঁচু স্থানে না থাকা। বজ্রপাতের সময় ধানক্ষেত বা খোলা মাঠে থাকলে তাড়াতাড়ি পায়ের আঙ্গুলের ওপর ভর দিয়ে এবং কানে আঙ্গুল দিয়ে মাথা নিচু করে বসে থাকতে হবে। যত দ্রুত সম্ভব দালান বা কংক্রিটের ছাউনির নিচে আশ্রয় নিতে হবে। টিনের চালা যথাসম্ভব এড়িয়ে চলতে হবে। উঁচু গাছপালা ও বৈদ্যুতিক খুঁটি ও তার বা ধাতব খুঁটি, মোবাইল টাওয়ার ইত্যাদি থেকে দূরে থাকতে হবে। কালো মেঘ দেখা দিলে নদী, পুকুর, ডোবা বা জলাশয় থেকে দূরে থাকতে হবে। বজ্রপাতের সময় গাড়ির ভেতর অবস্থান করলে, গাড়ির ধাতব অংশের সাথে শরীরের সংযোগ ঘটানো যাবে না; সম্ভব হলে গাড়িটি নিয়ে কোনো কংক্রিটের ছাউনির নিচে আশ্রয় নিতে হবে। বজ্রপাতের সময় বাড়িতে থাকলে জানালার কাছাকাছি ও বারান্দায় থাকা যাবে না। জানালা বন্ধ রাখুন এবং ঘরের ভিতরে বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম থেকে দূরে থাকতে হবে। বজ্রপাতের সময় মোবাইল, ল্যাপটপ, কম্পিউটার, ল্যান্ডফোন, টিভি, ফ্রিজসহ সকল বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম ব্যবহার থেকে বিরত থাকতে হবে এবং এগুলো বন্ধ রাখতে হবে। বজ্রপাতের সময় ধাতব হাতলযুক্ত ছাতা ব্যবহার করা যাবে না। জরুরি প্রয়োজনে প্লাস্টিক বা কাঠের হাতলযুক্ত ছাতা ব্যবহার করতে হবে। বজ্রপাতের সময় শিশুদের খোলা মাঠে খেলাধুলা থেকে বিরত রাখতে হবে এবং নিজেদেরও বিরত রাখতে হবে। বজ্রপাতের সময় ছাউনি বিহীন নৌকায় মাছ ধরতে যাওয়া যাবে না, তবে এ সময় সমুদ্র বা নদীতে থাকলে মাছ ধরা বন্ধ

শিল্পোন্নত দেশগুলোকে ক্ষতিপূরণ হিসেবে সাহায্য দিতে হবে। ক্ষতিপূরণসহ আন্তর্জাতিক তহবিল সংগ্রহের জন্য সরকারকেও অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে। তাছাড়া, সরকারকেও বজ্রপাতসহ সকল প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রতিরোধের জন্য জাতীয় বাজেটে বিশেষ বরাদ্দ প্রদান করতে হবে এবং প্রান্তিক পর্যায় পর্যন্ত এ বরাদ্দের কার্যক্রম পৌঁছে দিতে হবে। তবেই, এর সুফল সবাই পাবে।

লেখক: সহকারী তথ্য অফিসার, তথ্য অধিদপ্তর

ইতিহাস গড়ার প্রস্তুতি যেভাবে নিতে চলেছেন মুশফিক

বাংলাদেশের প্রথম ক্রিকেটার হিসাবে মুশফিকুর রহিম শততম টেস্ট খেলতে যাচ্ছেন আগামী মাসে। মিরপুরে আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে ঐতিহাসিক মাইলফলক ছোঁয়ার আগে নিজেকে ঝালিয়ে নিতে মুশফিক নামছেন ঘরোয়া লড়াইয়ে। জাতীয় ক্রিকেট লিগের (এনসিএল) লংগার ভার্সনে সিলেট বিভাগের হয়ে খেলবেন এই অভিজ্ঞ উইকেটকিপার-ব্যাটার।

তবে মুশফিকের খেলার চেয়েও বেশি আলোচনা এনসিএলের ময়মনসিংহ বিভাগের অভিষেক হওয়া নিয়ে। আজ দেশের চারটি ভেন্যুতে শুরু হচ্ছে চারদিনের ম্যাচের এ প্রতিযোগিতা। এনসিএল বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) ঘরোয়া ক্রিকেট কাঠামোর সবচেয়ে পুরোনো ও মর্যাদাপূর্ণ আসর।

সিলেট আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে স্বাগতিকদের বিপক্ষে মাঠে নামবে নবাগত ময়মনসিংহ। সিলেট আউটার মাঠে রংপুরের প্রতিপক্ষ ঢাকা। খুলনায় স্বাগতিকরা বরিশালের বিপক্ষে খেলবে। এছাড়া স্বাগতিক রাজশাহী মুখোমুখি হবে চট্টগ্রামের।

ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি থেকে মুশফিক অবসর নিয়েছেন আগেই। টেস্টে এখনো দলের নির্ভরযোগ্য ব্যাটারদের একজন তিনি। শততম টেস্টকে সামনে রেখে দীর্ঘদিন পর এনসিএলের লংগার ফরম্যাটে খেলবেন, যাতে ম্যাচ ফিটনেস ও লম্বা ইনিংস খেলার ছন্দ ফিরে পান।

বিসিবির ঘোষিত সূচি অনুযায়ী এনসিএলের সব ম্যাচ হবে মিরপুর, রাজশাহী, সিলেট, বগুড়া, খুলনা, চট্টগ্রাম, বিকেএসপি ও কক্সবাজারের দুটি মাঠে। জাতীয় দলের ক্রিকেটারদের পাশাপাশি তরুণ প্রতিভারাও খেলবেন। এবারই প্রথম এনসিএলের মূলপর্বে অংশ নিচ্ছে ময়মনসিংহ বিভাগ।

শুভাগত হোম চৌধুরীর নেতৃত্বে দলে রয়েছেন মোহাম্মদ নাঈম, মাহফিজুল ইসলাম, আইচ মোল্লা ও আল আমিন হোসেন। ২০০৫ সালে ইংল্যান্ড সফর দিয়ে টেস্ট ক্রিকেটে মুশফিকের পথচলা শুরু হয় মাত্র ১৮ বছর বয়সে। ২০ বছরের ক্যারিয়ারে ৯৮ টেস্ট খেলেছেন তিনি। নভেম্বরে আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে দুই ম্যাচের হোম সিরিজে খেলে বাংলাদেশের প্রথম ক্রিকেটার হিসাবে শততম টেস্ট খেলার অনন্য গৌরবের অধিকারী হবেন মুশফিক।

সূত্র: যুগান্তর ।

ভালো মেয়ে; সমাজের তৈরি মুখোশ নাকি নারীর পরিচয় হারানোর গল্প?

ছোটবেলা থেকেই মেয়েদের শেখানো হয় “ওখানে যাবে না, ওটা সেইফ না”, “ওটা করবে না, সেইফ না”। “চুপ করে থাকো, তবেই সবাই তোমায় ভালো বলবে।” “বেশি কথা বলো না, বেশি হাসো না, বেশি মিশো না।” তুমি মেয়ে এখানে চলবে না, তুমি মেয়ে ওভাবে বলবেনা,মাথা নামিয়ে, চলো, নিচু স্বরে কথা বলো, তা না হলে লোকে খারাপ বলবে। প্রথমে মা, চাচী, দাদী বলে পরে পাড়া পড়শী মহিলারা।

যেন একটা শব্দহীন শিকল নারীর পায়ে বেড়ি দিয়েছে। যেন শব্দহীন লোহার বেড়ি নারীর গলাটাকে আটকে ধরেছে। ভালো মেয়ে হতে যেয়ে “না” শব্দের দৃশ্যহীন মালা গলায় পরে নিতে হয়েছে। এই “না” শব্দটার মাঝে অসহায়ত্বকে ফুটিয়ে তুলে বার বার স্মরণ করিয়ে দেয় তোমাকে ভালো মেয়ে হতে হবে। ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর থেকেই নারীর পায়ে ভালো মেয়ের

শব্দহীন শিকল বেঁধে রেখেছে। আসলে আমরা নারীরা ছোটবেলা থেকেই নিজেদের কন্ডিশন করে ফেলি, কোনটা ভালো, কোনটা মন্দ, কোনটা সেইফ, বা কোনটা সেইফ না। কন্যা শিশু জন্মানোর সঙ্গে সঙ্গেই এই কন্ডিশনিংটা ভূতের মতো বাবা-মা-পরিবারের সবার ঘাড়ের ওপরেই চেপে বসে।

সমাজে “ভালো মেয়ে” বলতেই আমরা এক ধরনের নির্দিষ্ট ছাঁচে গড়া নারীর চিত্র কল্পনা করি — যে ভদ্র, শান্ত, পর্দানশীল, সংসারী, বাধ্য, পুরুষের কথা নিঃশর্তে মেনে চলে। ছোটবেলা থেকেই মেয়েদের শেখানো হয় — “এভাবে বসো না”, “জোরে কথা বলো না”, “রাতে বাইরে যেও না”, “ছেলেদের সঙ্গে বেশি মিশো না”, “ভালো মেয়ে এমন হয় না। ”ভালো মেয়ে সে–ই, যে চুপচাপ থাকে, প্রতিবাদ করে না, সবার কথা মেনে চলে, নিজের চাওয়া-পাওয়ার কথা প্রকাশ করে না। সমাজের চোখে যে মেয়ে বিনয়ী, বাধ্য, নিরব, আজ্ঞাবহ — তাকেই ভালো বলা হয়। কিন্তু এই ধারণা মেয়েদের নিজের চিন্তা, মতামত ও স্বপ্নকে চাপা দেয়। কিন্তু প্রশ্ন হলো — এই “ভালো মেয়ে” ধারণা কি সত্যিই নারীর গুণ, নাকি সমাজের এক অদৃশ্য শিকল?

এই “ভালো মেয়ে” হওয়ার শিক্ষা ছোটবেলা থেকেই মেয়েদের মনে গেঁথে দেওয়া হয়। ফলে মেয়েরা বড় হয় এক ধরনের অন্তর্নিহিত ভয়, বাধ্যতা আর অপরাধবোধ নিয়ে। অর্থাৎ, সমাজ মেয়েদের ভদ্রতা শেখায়, কিন্তু আত্মবিশ্বাস শেখায় না। ফলে তারা বড় হয়ে ভাবে, নিজের ইচ্ছা প্রকাশ করা মানেই অন্যায় করা। একজন ছেলেকে যখন বলা হয় “তুমি পারবে”, তখন একজন মেয়েকে বলা হয় “তুমি সাবধান থাকো।” ছেলেদের শেখানো হয় “সাহসী হও”, “বলো”, “লড়ো”, কিন্তু মেয়েদের বলা হয় “চুপ থাকো”, “সহ্য করো”, “ভদ্র থাকো”। ফলে একটা সময় পরে মেয়েরা বুঝে ফেলে, সমাজের ভালোবাসা পেতে হলে তাকে নিজের ব্যক্তিত্ব গোপন রাখতে হবে।

সে নিজের ভাবনা লুকিয়ে রাখে, কারণ সমাজ তার চিন্তা, রাগ, বা প্রতিবাদকে গ্রহণ করতে জানে না। এই এক কথার পার্থক্যই তৈরি করে দুই ধরনের জীবনদর্শন।

“ভালো মেয়ে” শব্দটা কখনোই মেয়েদের জন্য নয়। এটা সমাজের সুবিধার জন্য তৈরি করা একটি নিয়মের ছাঁচ। যাতে নারীকে সহজে নিয়ন্ত্রণ, বিচার ও সীমাবদ্ধ করা যায়। “ভালো মেয়ে” ধারণা সমাজের এক ধরনের নিয়ন্ত্রণের অস্ত্র। এর মাধ্যমে মেয়েদের স্বাধীন চিন্তা, পছন্দ-অপছন্দ, এমনকি জীবনযাপনের ধরনও নিয়ন্ত্রণ করা হয়। এই ধারণা ধীরে

ধীরে নারীদের আত্মবিশ্বাস, আত্মসম্মান, এমনকি তাদের সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষমতাকেও দুর্বল করে দেয়। এটা একরকম মানসিক শৃঙ্খল — যা নারীর ভেতরের শক্তিকে চুপ করিয়ে রাখে “ভদ্রতার” নামে।

যখন কোনো মেয়ে নিজের মতো করে বাঁচতে চায়। নিজের পছন্দের পোশাক পরে, ক্যারিয়ার গড়ে, বা সম্পর্ক নিয়ে সিদ্ধান্ত নেয়। তখন সমাজ বলে, “ও খুব বেপরোয়া!”। যে মেয়েটি নিজের মতামত প্রকাশ করে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়ায়, সে অনেক সময় সমাজের চোখে “খারাপ মেয়ে” হয়ে যায়। যে মেয়ে অন্যায়ের বিরুদ্ধে মুখ খোলে, সে সমাজে “অভদ্র”, “বেশি কথা বলে”, “অবাধ্য” বলে চিহ্নিত হয়।

অর্থাৎ, সমাজ চায় ভদ্র মেয়ে, কিন্তু চায় না সচেতন নারী।

অর্থাৎ সমাজ চায় না নারী স্বাধীনভাবে ভাবুক বা সিদ্ধান্ত নিক, বরং সমাজ চায় সে সম্মত হোক, বাধ্য থাকুক, নিরব থাকুক। সমাজের মতো করে বাঁচতে যেয়ে, সমাজে ভালো মেয়ে হতে যেয়ে মেয়েরা আত্নবিশ্বাস হারিয়ে ফেলে। লোকে কিভাবে ভালো বলবে-এই মানসিকতা নারীর মানসিক বিকাশে বাধা সৃষ্টি করে। সে নিজের স্বাধীন চিন্তাকে অপরাধ মনে করতে শুরু করে। ফলে মেয়েরা দুটি জীবনে বাস করে। একটি সমাজের সামনে “ভালো মেয়ে” সেজে থাকা, আর অন্যটি নিজের মধ্যে অবদমিত, ক্লান্ত, স্বপ্নহীন এক সত্তা।

এভাবেই “ভালো মেয়ে” হওয়ার চাপ নারীর আত্মপরিচয়কে ক্ষয় করে ফেলে। অর্থাৎ, সমাজের চোখে ভালো মেয়ে সেই, যে সমাজের নিয়মে বাঁচে, নিজের নিয়মে নয়।

অন্যদিকে, কেউ কেউ বলেন — “ভালো মেয়ে” ধারণা সংস্কৃতির অংশ, যা শালীনতা, সহনশীলতা, সৌজন্য, পারিবারিক মূল্যবোধকে টিকিয়ে রাখে। “ভালো মেয়ে” ধারণা সংস্কৃতির অংশ, যা শালীনতা, পারিবারিক বন্ধন ও সামাজিক মূল্যবোধকে রক্ষা করে। তাদের মতে, সমাজে সৌহার্দ্য বজায় রাখতে কিছু নিয়ম থাকা দরকার — যেমন বয়োজ্যেষ্ঠদের সম্মান, দায়িত্বশীলতা, সহমর্মিতা ইত্যাদি। কিন্তু সমস্যা হয় যখন এই মূল্যবোধগুলো কেবল মেয়েদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয় এবং মেয়েদের চরিত্র বিচার হয় তাদের পোশাক, সময় ব্যবস্থাপনা বা সামাজিক আচরণের ওপর; অথচ ছেলেদের জন্য এমন কোনো কঠোর মানদণ্ড নেই।

সংস্কৃতি তখন ন্যায্য থাকে না, বরং হয়ে ওঠে পক্ষপাতদুষ্ট। এইভাবে “ভালো মেয়ে” ধারণা নারীদের উপর নৈতিক পুলিশিংয়ের হাতিয়ার হয়ে দাঁড়ায়। অনেকে বলেন — “ভালো মেয়ে” ধারণা সংস্কৃতির অংশ, যা

শালীনতা, পারিবারিক বন্ধন ও সামাজিক মূল্যবোধকে রক্ষা করে। কিন্তু প্রশ্ন হলো, যদি সেই সংস্কৃতি নারীর স্বাধীনতা কেড়ে নেয়, তবে সেটা সংস্কৃতি নয় বরং যুগ যুগ ধরে চলা সামাজিক শাসনের রূপ। সংস্কৃতি কখনোই একপাক্ষিক হতে পারে না। যেখানে ছেলেদের স্বাধীনতা প্রশংসিত, আর মেয়েদের স্বাধীনতা প্রশ্নবিদ্ধ। সেই জায়গায় সংস্কৃতি নয়, দ্বিচারিতা কাজ করছে।

অনেকে বলে, এটি আমাদের সংস্কৃতির অংশ।মেয়েরা নম্র, ভদ্র, লাজুক হবে — এটাই তো আমাদের ঐতিহ্য। কিন্তু প্রশ্ন হলো, সংস্কৃতি কাকে বলে?

সংস্কৃতি তো জীবনের সৌন্দর্য ও সমতার প্রতিফলন,যে চিন্তা নারীর কণ্ঠরোধ করে, তাকে কষ্ট দেয়, তাকে ছোট করে, তা কোনো সংস্কৃতি নয়, তা সমাজের তৈরি শিকল। যদি সংস্কৃতি নারীর স্বাধীনতা কেড়ে নেয়, তবে সেটা সংস্কৃতি নয় বরং যুগ যুগ ধরে চলা সামাজিক শাসনের রূপ।

আজকের পৃথিবীতে মেয়েরা আর সেই পুরনো মানদণ্ডে আটকে নেই। তারা জানে — ভালো মেয়ে হওয়া মানে কারো সামনে নত হওয়া নয়,বরং নিজের প্রতি সত্য থাকা। ভালো মেয়ে সে-ই, যে অন্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, কিন্তু নিজের সম্মান নিয়েও সচেতন।

তারা ভালোবাসে, কিন্তু ভালোবাসার নামে নিজের স্বপ্ন বিসর্জন দেয় না। তারা ডাক্তার, প্রকৌশলী, সাংবাদিক, সৈনিক, উদ্যোক্তা, তারা মা-ও, কর্মীও, আর নিজের পৃথিবীর অধিনায়কও।

তারা প্রমাণ করছে — “ভালো মেয়ে”র সংজ্ঞা এখন নতুন করে লিখতে হবে। যেখানে স্বাধীনতা অপরাধ নয়, আর স্বপ্ন বিলাসিতা নয়।

দেশে পানীয় জলের ঘাটতি ও

ক্রমবর্ধমান বৈষম্য

বর্তমান বিশ্বের একটি জটিল ও উদ্বেগজনক বাস্তবতা পানি সংকট। যদিও পৃথিবীর একটি বড় অংশ জলমণ্ডিত,তবু ব্যবহারের জন্য উপযোগী পানযোগ্য পানির পরিমাণ সীমিত। জনসংখ্যা বৃদ্ধি, অপরিকল্পিত নগরায়ণ, জলবায়ু পরিবর্তন এবং দূষণের কারণে এই সংকট আরও ঘনীভূত হচ্ছে। শহর ও গ্রামের মধ্যে পানীয় জলের বৈষম্য বাড়ছে। ওয়াটার এইড-এর এক প্রতিবেদনে দেখা গেছে, শহর ও গ্রামের মধ্যে বৈষম্য আরও বেড়েছে, যা একটি বড় চ্যালেঞ্জ।
জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে লবণাক্ততা বৃদ্ধি পাওয়ায় মিষ্টি পানির অভাব দেখা দিয়েছে। বঙ্গোপসাগরের খুব কাছে হওয়ায় ভূগর্ভস্থ পানিতে আর্সেনিকের পরিমাণও অনেক বেশি। বিশেষজ্ঞরা বলছে ভবিষ্যতে পানীয় জলের সন্ধানের লড়াই আরও তীব্র হবে। উত্তর বাংলাদেশের খরা-প্রবণ বরেন্দ্রভূমি এলাকায়, মানুষকে নিরাপদ পানীয় জল পেতে ৩৫০ মিটারের বেশি খনন করতে হবে। পরিস্থিতি আরও খারাপ হতে পারে, কারণ এই এলাকায় অস্বাভাবিকভাবে কম বৃষ্টিপাতের অর্থ হল ভূগর্ভস্থ জলাধারগুলি পুনরায় পূরণ হচ্ছে না। এমনকি ঢাকায়ও মানুষ পানির সরবরাহ কমে যেতে পারে। ঢাকার ভূগর্ভস্থ জলরাশিগুলি রিচার্জ হয় যা আশেপাশের জেলাগুলিতে ভূগর্ভস্থ জলে সঞ্চারিত হয়। তবে সেই জেলাগুলিতে ভূগর্ভস্থ মিঠা জলের স্তরও নেমে গেছে, যার ফলে সমুদ্রের জল জলাশয়ে প্রবেশ করতে শুরু করেছে। এভাবে চলতে থাকলে ঢাকার পানীয় জল ক্রমশই পানের অযোগ্য হয়ে উঠতে পারে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। খারাপ পানির গুণমান কৃষিকে প্রভাবিত করবে। বাংলাদেশ ধান, পাট, গম, চা, ডাল, তৈলবীজ, শাকসবজি এবং ফল চাষের জন্য উৎসর্গীকৃত জমির ৭০ শতাংশ সহ কৃষির উপর ব্যাপকভাবে নির্ভর করে। দূষিত নলকূপগুলি সেচের জন্য ব্যবহৃত বেশিরভাগ পানি সরবরাহ করে। ফলস্বরূপ, উচ্চ মাত্রার আর্সেনিক অনেক ফসলের উদ্ভিদ, বিশেষ করে ধান এবং মূল শাকসবজি দ্বারা শোষিত হয়। এটি মারাত্মক হতে পারে।
বাংলাদেশে পানীয় জলের ঘাটতি ও বৈষম্য জলবায়ু পরিবর্তন, অপরিকল্পিত নগরায়ণ, দূষণ এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে বাড়ছে, যেখানে ২০৫০ সালের মধ্যে প্রায় ২৫ শতাংশ মানুষ পানি সংকটে পড়বে বলে ধারণা করা হচ্ছে। এই সংকটের কারণে শহর ও গ্রামের মধ্যে বৈষম্য বাড়ছে, এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠী এর শিকার হচ্ছে। এর সমাধান হিসেবে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় দ্রুত পদক্ষেপ, পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন, এবং সবার জন্য পানির অধিকার নিশ্চিত করা প্রয়োজন।
পানির মান উন্নত করার জন্য জরুরি পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে বাংলাদেশ দারিদ্র্য হ্রাস করতে পারে এবং দ্রুত প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করতে পারে, বিশ্বব্যাংকের একটি নতুন প্রতিবেদনে বলা হয়েছে। পানি অ্যাক্সেসের উন্নতিতে দেশের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি

না।
সাতক্ষীরা, খুলনা, বাগেরহাট, বরগুনা, ঝালকাঠি, পটুয়াখালী, পিরোজপুরসহ উপকূলীয় অঞ্চল এবং সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ, নেত্রকোনা, কিশোরগঞ্জসহ হাওর অঞ্চলের গ্রামীণ নারী ও কিশোরীদের প্রতিদিনের একটি বড় সময় কাটে দূর-দূরান্ত থেকে পানীয় জল সংগ্রহে। এই দীর্ঘ পথ পাড়ি দিতে গিয়ে তারা অনেক সময় যৌন হয়রানি ও নিরাপত্তা ঝুঁকির সম্মুখীন হন। জাতিসংঘের ওয়ার্ল্ড ওয়াটার ডেভেলপমেন্ট রিপোর্টে বলা হয়েছে, বিশ্বে এখনো ২.২ বিলিয়ন মানুষ নিরাপদ পানীয় জলের অভাবে ভুগছে এবং ৩.৫ বিলিয়ন মানুষ পর্যাপ্ত স্যানিটেশন সুবিধা থেকে বঞ্চিত।
উত্তর আফগানিস্তানে কুশ তেপা খাল নির্মাণ প্রকল্পের কথা বিবেচনা করলে দেখা যাবে এটি মূলত সেচ ব্যবস্থার উন্নয়ন ও সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদনের উদ্দেশ্যে গঠিত। তবে এই প্রকল্পটি আমু দরিয়া নদীর প্রায় ২০ শতাংশ পানি সরিয়ে নেবে, যার ফলে উজবেকিস্তানের কিছু অঞ্চলের চাষাবাদ মারাত্মকভাবে ব্যাহত এবং পানির ঘাটতি আরও তীব্র হবে। এতে দুই দেশের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কে টানাপড়েন সৃষ্টি হয়েছে। একইভাবে, বাংলাদেশও বহু বছর ধরে প্রতিবেশী দেশ ভারতের কাছ থেকে ন্যায্য পানির হিস্যা আদায়ে জোর দাবি জানিয়ে যাচ্ছে। যৌথ নদী কমিশনের (জেআরসি) চুক্তি অনুসারে, বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে ন্যায্য পানিবণ্টন নিয়মিত পর্যবেক্ষণ ও যাচাই করা জরুরি। ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে পেহেলগাম ইস্যু ঘিরে যে যুদ্ধাবস্থা ও উত্তেজনা তৈরি হয়, সেখানেও ভারত সিন্ধু নদের পানি বন্ধ করে দেওয়ার হুমকি দেয়। এভাবে আমরা দেখতে পাই, কখনো কৃত্রিম খাদ্য সংকট সৃষ্টির মাধ্যমে গাজার হাজারো মানুষকে দুর্ভিক্ষের দিকে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে, আবার কখনো আন্তঃদেশীয় নদীর পানির প্রবাহকে বাধাগ্রস্ত করে প্রতিবেশী দেশকে হুমকি দেওয়া হচ্ছে। দুঃখজনক হলেও সত্যি যে, পানি বা খাদ্য উভয়ই আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে।
জাতিসংঘ সতর্ক করে দিয়েছে যে ‘বিশ্বে শান্তি ও স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠার জন্য নিরাপদ ও বিশুদ্ধ পানীয় জল নিশ্চিত করা অপরিহার্য।’ বিভিন্ন গবেষণায় স্পষ্টভাবে উঠে এসেছে, আমরা দ্রুত এক বৈশ্বিক পানি সংকটের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। গত জুন মাসে ‘মার্সি কর্পস’ নামের একটি আন্তর্জাতিক বেসরকারি সংস্থা বলেছে আফগানিস্তানের কাবুল বিশ্বের প্রথম আধুনিক শহর হতে পারে, যেখানে নিকট ভবিষ্যতে পানি শেষ হয়ে যাবে। এছাড়াও প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, প্রাকৃতিক রিচার্জের হারের চেয়েও বেশি পানি উত্তোলন এবং সীমিত পরিমাণে পানি দূষণের সমস্যা দেখা দেওয়ায় শহরটি এক চরম বিপর্যয়ের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। এই সংকটে আমরা কোথায়?: শিল্পায়ন, বৃষ্টির পানি সংগ্রহ ও সংরক্ষণের অভাব, অকার্যকর মজুদ ব্যবস্থাপনা, পানির অসম বণ্টন, তাপমাত্রা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভূগর্ভস্থ পানির অতিরিক্ত ব্যবহার এ সবই বাংলাদেশের পানি সংকটকে দিন দিন তীব্রতর

করে তুলছে। শুষ্ক মৌসুমে বিশেষ করে বোরো ধান উৎপাদনের জন্য বিপুল পরিমাণ পানির প্রয়োজন, যার প্রধান উৎসই ভূগর্ভস্থ পানি। বাংলাদেশে বার্ষিক মোট বৃষ্টিপাতের ৭০-৮০ শতাংশ হয় জুন থেকে অক্টোবরের মধ্যে। এই বৃষ্টির পানি প্রাকৃতিকভাবে লবণাক্ততা ও আর্সেনিকমুক্ত এবং এতে ক্ষতিকর খনিজের মাত্রাও কম, ফলে এটি মানুষের ব্যবহারের জন্য অনেক বেশি নিরাপদ। বিশাল পরিমাণ বৃষ্টির জল যথাযথভাবে সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করতে পারলে ভূগর্ভস্থ পানির ওপর নির্ভরতা অনেকটাই কমানো সম্ভব। ফলে বিদ্যুৎ সাশ্রয় হবে এবং জাতীয় গ্রিডের ওপর চাপ হ্রাস পাবে। তাই রেইন ওয়াটার হার্ভেস্টিং ব্যবস্থাকে আরও জনপ্রিয় করে তোলার জন্য এর প্রসার ও সচেতনতা জরুরি।
ঢাকা শহরের মতো শহুরে এলাকায়, যেখানে ক্রমবর্ধমান চাহিদার ফলে ভূগর্ভস্থ পানি দ্রুত হ্রাস পাচ্ছে, সেখানে বৃষ্টির পানি সংগ্রহ একটি বাস্তবসম্মত ও অর্থনৈতিক সমাধান হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। টেকসই ভবিষ্যতের জন্য সরকার পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ (PPP) এর মাধ্যমে বৃষ্টির পানি সংগ্রহে দীর্ঘমেয়াদি উদ্যোগ নিতে পারে। এর সফল বাস্তবায়নের জন্য রাজনৈতিক ইচ্ছাশক্তি এবং সামাজিক সহযোগিতা জরুরি। রেইন ওয়াটার হার্ভেস্টিংয়ে বেসরকারি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করতে দৃঢ় নীতি গ্রহণের মাধ্যমে বাংলাদেশের উজান পরিবেশের অবক্ষয় রোধে গুরুত্ব দিতে হবে। সরকার ও উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠানগুলো ওয়াটার হার্ভেস্টিং সরঞ্জাম ও প্রযুক্তিতে ভর্তুকি প্রদান করে সাধারণ মানুষের উৎসাহ বাড়াতে পারে। বিশেষজ্ঞদের মতে- যদি তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ ঘটে, তা হবে পানির ন্যায্য বণ্টন নিয়ে বিরোধের কারণে। তাই একটি স্থিতিশীল বৈশ্বিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য, মানবাধিকার রক্ষা ও টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে, দারিদ্র্য বিমোচন এবং ধনী-গরিবের মধ্যে বৈষম্য কমাতে, পানির সুষ্ঠু ও ন্যায্য বণ্টন অপরিহার্য।
লেখক: সাংবাদিক

১ যুগে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ১ লাখ ১৬ হাজারের বেশি

বিগত ১২ বছরে সারাদেশে ৬৭ হাজার ৮৯০টি সড়ক দুর্ঘটনায় ১ লাখ ১৬ হাজার ৭২৬ জন নিহত ও ১ লাখ ৬৫ হাজার ২১ জন আহত হয়েছেন বলে দাবি করেছে বাংলাদেশ যাত্রী কল্যাণ সমিতি।

সংগঠনটি বলেছে, দুর্নীতি, ভুলনীতি ও পরিবহন খাতে চাঁদাবাজি সড়কে ‘গণহত্যার’ জন্য দায়ী।

মঙ্গলবার সকালে জাতীয় নিরাপদ সড়ক দিবস ২০২৫ উপলক্ষে রাজধানীর ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে সংগঠনের মহাসচিব মো. মোজাম্মেল হক চৌধুরী এসব তথ্য তুলে ধরেন।

তিনি বলেন, স্বাধীনতার আগে দেশের ৮০ শতাংশ মানুষ নৌ ও রেলপথে চলাচল করত এবং মাত্র ২০ শতাংশ মানুষ সড়কপথ ব্যবহার করত। ফলে সড়ক দুর্ঘটনাও সীমিত ছিল।

কিন্তু স্বাধীনতার পর দাতা সংস্থার প্রেসক্রিপশনে একের পর এক সড়ক নির্মাণ ও সংস্কারের নামে ব্যাপক লুটপাট এবং সড়কে একচেটিয়া চাপ বাড়ানোর কারণে এখন ৮০ শতাংশ মানুষ সড়কপথে চলাচল করছে, আর দুর্ঘটনাও ৮০ শতাংশ বেড়েছে।

মোজাম্মেল হক চৌধুরী বলেন, ‘বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের সময়ে পরিবহন খাতে সীমাহীন অনিয়ম-দুর্নীতি, পরিবহন মালিক-শ্রমিক ও দুর্নীতিবাজ পুলিশ কর্মকর্তাদের চাঁদাবাজি, ফিটনেসবিহীন যানবাহন, অপ্রাপ্তবয়স্ক ও মাদকাসক্ত চালক, এবং লাইসেন্সহীন গাড়ি চলাচলের কারণে সড়কে বিশৃঙ্খলা ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে।’

তিনি আরও বলেন, শুধুমাত্র গণমাধ্যমে প্রকাশিত তথ্যের ওপর ভিত্তি করে এই হিসাব করা হয়েছে, বাস্তব সংখ্যা আরও অনেক বেশি।

যাত্রী কল্যাণ সমিতির পরিসংখ্যানে দেখা যায়, ২০১৪ সাল থেকে ২০২৫ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সময়ে সড়কে ১ লাখ ১৬ হাজারের বেশি মানুষ নিহত হয়েছেন।

সংগঠনটির ভাষায়, ‘একই সময়ে ইসরায়েল-ফিলিস্তিন যুদ্ধে গাজায় নিহত ৬৭ হাজার, আর ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধে ৪৫ হাজার মানুষ নিহত হয়েছে। অথচ বাংলাদেশের সড়কে নিহতের সংখ্যা সেই যুদ্ধের চেয়েও বেশি।’

তারা বলেন, ‘এ যেন দেশের সড়কে এক প্রকার গণহত্যা, যার দায় সরকারের ভুলনীতি ও দুর্নীতি।’

সংগঠনের মতে, দীর্ঘদিন সড়ক পরিবহন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে থাকা ওবায়দুল কাদেরের সময়েও পরিবহনে বিশৃঙ্খলা রোধে কোনো কার্যকর পরিকল্পনা দেখা যায়নি।

ছাত্র-জনতার আন্দোলনে সরকার পরিবর্তনের পরও নীতিমালায় দৃশ্যমান পরিবর্তন না আসায় দুর্ঘটনা ও যানজট বেড়েই চলছে।

সংবাদ সম্মেলনে সড়কে শৃঙ্খলা ও দুর্ঘটনা কমাতে সংগঠনটি ১২ দফা সুপারিশ উপস্থাপন করে। এর মধ্যে রয়েছে—নৌ ও রেলপথকে সড়কের সঙ্গে সমন্বয় করে একীভূত পরিবহন নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা।

পরিবহন খাতের চাঁদাবাজি, অনিয়ম ও দুর্নীতি বন্ধে কাঠামোগত সংস্কার।

ঢাকা-চট্টগ্রামসহ বিভাগীয় শহরে সরকারি উদ্যোগে পাতাল মেট্রোরেল চালু।

প্রতিটি শহরে ডিজিটাল লেনদেনভিত্তিক অন্তত দুটি বাস র্যাপিড ট্রানজিট (BRT) লেন চালু।

জেলা-উপজেলা পর্যন্ত শক্তিশালী বাস নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা।

মোটরসাইকেল ও ব্যাটারিচালিত অটোরিকশা আমদানি ও বিপণন বন্ধ।

প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও দক্ষ চালক তৈরিতে সরকারি উদ্যোগ।

ট্রাফিক ব্যবস্থাপনায় ডিজিটাল প্রযুক্তি প্রয়োগ ও ট্রেনিং একাডেমি প্রতিষ্ঠা।

সড়ক দুর্ঘটনার মামলায় সরকারি উদ্যোগে ক্ষতিপূরণ প্রদান।

যাত্রী প্রতিনিধি অন্তর্ভুক্ত করে সিদ্ধান্তগ্রহণে স্বচ্ছতা।

সরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের জবাবদিহি নিশ্চিতকরণ।

সারাদেশে সাইক্লিস্ট ও পথচারীদের জন্য আলাদা লেন ও নিরাপদ ফুটপাত নির্মাণ।

সংবাদ সম্মেলনে আরও উপস্থিত ছিলেন, যাত্রী কল্যাণ সমিতির সভাপতি শরীফ রফিকুজ্জামান, বারভিটার সভাপতি আবদুল হক, ড্রাইভার্স ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশনের চেয়ারম্যান বাদল আহমেদ প্রমুখ।

সূত্র: দ্য নিউজ ২৪ ।

[redacted]

[redacted]

অন্যান্য সুবিধা দখল করে নেয় । নিরাপদ আশ্রয় ও নিয়মিত জীবনধারণের অভাবে তারা স্বাস্থ্যসেবা ও শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়। প্রযুক্তির সহায়তায় জলবায়ু উদ্বাস্তুদের ট্র্যাকিং এর মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করে তাদের জন্য টেকসই পুনবাসন নিশ্চত করার উদ্যোগ নিলে সুফল পাওয়া যাবে।তাদের কর্মসংস্থান, খাদ্যনিরাপত্তা এবং বাসস্থনের ব্যবস্থা করতে হবে। শহর ও গ্রামে উভয় জায়গায় জলবায়ু উদ্বাস্তুদের জন্য গুরুত্বসহকারে সমানভাবে কাজ করতে হবে। জলবায়ু উদ্বাস্তুদের মধ্যে নারী, শিশু, প্রবীণ ও প্রতিবন্ধীদের মতো ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠী রয়েছে। সবার জন্য এক রকম সমাধান কার্যকর হবে না,প্রত্যেককে তার প্রয়োজন অনুযায়ী সমস্যার সমাধান দিতে হবে। সমস্যাগুলো কম-বেশি আমরা সবাই জানি,সমাধানের পথও আমাদের জানা আছে, দরকার শুধু আন্তরিকতা, প্রস্তুতি এবং সদিচ্ছা।
লেখক: সিনিয়র তথ্য অফিসার, তথ্য অধিদপ্তর।

মিরপুরে আগুনে নিহত ১৬ জনের লাশ পরিবারের কাছে হস্তান্তর

রাজধানীর মিরপুরের রূপনগর এলাকায় কেমিক্যাল গুদামে লাগা ভয়াবহ আগুনে নিহত ১৬ জনের লাশ স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। গতকাল রবিবার (১৯ অক্টোবর) রাতে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ মর্গ থেকে তাদের লাশ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়।

লাশ হস্তান্তর করা ১৬ জন হলেন- নুর আলম, রবিউল ইসলাম, মৌসুমী খাতুন, আল মামুন, সানোয়ার হোসেন, ফারজানা আক্তার, মুনা আক্তার, জয় মিয়া, মুক্তা বেগম, নাজমুল ইসলাম, তোফায়েল আহামেদ, খালিদ হাসান, আব্দুল আলিম, আসমা, নার্গিস আক্তার ও মাহিরা।

রূপনগর থানার পরিদর্শক (তদন্ত) মোখলেছুর রহমান এ তথ্য দেন।

লাশ হস্তান্তরের সময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন এই থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) মুখলেছুর রহমান।
পুলিশ বলছে, ১৬ জনের পরিচয় ডিএনএ’র মাধ্যমে শনাক্ত হয়। ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ মর্গ থেকে রাতে পর্যায়ক্রমে নিহতদের লাশ তাদের পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়। ১৪ জনের পরিবার মর্গে এসেছেন।

তিনি বলেন, পর্যায়ক্রমে সবার লাশ হস্তান্তর করা হবে।

এদিকে দুর্যোগ ব্যাপস্থাপনা মন্ত্রণালয়ের অর্থায়নে জেলা প্রশাসনে পক্ষ থেকে নিহদের পরিবারকে দাফন-কাফন যাতায়াত বাবদ ২৫ হাজার টাকা দেওয়া হয় বলে জানিয়েছেন প্রকৌশলী মো. জাকির হোসাইন (তেজগাঁও উন্নয়ন সার্কেল)।

সূত্র: কালের কন্ঠ।

চাই একটি মানবিক বাংলাদেশ

মানবিকতা একটি জাতির সভ্যতার মাপকাঠি। শুধু প্রযুক্তি, অবকাঠামো বা অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিই একটি দেশকে উন্নত করে না। বরং মানুষের মধ্যে যদি পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা,সহানুভূতি না থাকে, তাহলে সেই উন্নয়ন অনেকাংশেই অর্থহীন। একটি মানবিক সমাজ গড়ে তুলতে হলে আগে মানুষকে মানুষ হিসেবে দেখতে শিখতে হবে। উন্নয়ন তখনই টেকসই হয়, যখন তার ভেতর মানবিকতা থাকে। তাই “মানবিক বাংলাদেশ” গঠন আজ সময়ের দাবি। মানবিকতা মানে শুধু দয়া-সহানুভূতি নয়; এটি হলো মানুষে মানুষে শ্রদ্ধা, ভালোবাসা, সহনশীলতা ও সহযোগিতার মনোভাব। ধর্ম, বর্ণ, ভাষা বা রাজনৈতিক মতভেদ ভুলে সবাইকে মানুষ হিসেবে মূল্যায়ন করাই মানবিকতার প্রকৃত রূপ।

সব ধর্মেই মানবিকতার শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। ইসলাম বলে, “যে ব্যক্তি একজন মানুষকে বাঁচায়, সে যেন সমগ্র মানবজাতিকে বাঁচাল।” অন্যান্য ধর্মও মানুষে মানুষে ভালোবাসা ও শান্তির বার্তা দেয়। তাই মানবিক বাংলাদেশ মানে ধর্মীয় মূল্যবোধের বাস্তব প্রয়োগ। তবে শুধু গণতন্ত্র,অর্থনৈতিক উন্নয়নই যথেষ্ট নয়, আমাদের প্রয়োজন একটি মানবিক বাংলাদেশ যেখানে মানুষে মানুষে ভালবাসা, সহানুভূতি, সহমর্মিতা এবং মানবিক মূল্যবোধ থাকবে। বাংলাদেশকে একটি মানবিক রাষ্ট্র হিসেবে দেখতে চাই। যে দেশে মানুষ মানুষকে সন্মান করবে, মানুষের সকল অধিকার নিশ্চিত হবে। যে দেশে কোন যুবক বেকার থাকবেনা। সকলের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা হবে। মিথ্যা শঠতা থাকবে না; থাকবে না অন্যকে অসম্মানিত না করা। নারী সে শিক্ষার্থী হোক বা কর্মজীবী হোক সবক্ষেত্রে সেজেনো নিরাপদ অনুভব করে;সেই

স্বপ্নের দেশ চাই। এর জন্য প্রয়োজন দেশের সকল জনগণের সচেতনতা,সহযোগিতা ও সমর্থন ।

আমরা চাই মানবিক বাংলাদেশ। মানবিক বাংলাদেশ হবে এমন এক দেশ, যেখানে প্রতিটি মানুষ অন্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবে; গরীব-ধনী, নারী-পুরুষ, শিশু-বৃদ্ধ সবাই সমান সম্মান সমহিমায় পাবে; শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সেবা সকলের জন্য নিশ্চিত হবে; পথশিশু, অসহায় ও প্রতিবন্ধীরা সুযোগ পাবে স্বাভাবিক জীবনের; সহানুভূতি, সহমর্মিতা ও সামাজিক দায়িবোধ থাকবে প্রতিটি নাগরিকের মাঝে;ধর্ম-বর্ণ-গোত্র নির্বিশেষে সকলে মিলেমিশে বসবাস করবে।

একটি মানবিক বাংলাদেশ গড়তে হলে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় নৈতিক শিক্ষা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। শিক্ষাকে রাজনৈতিক দৃষ্টি থেকে দেখা যাবে না। আমাদের সমাজে যে নৈতিক অবক্ষয়, আত্মকেন্দ্রিকতা ও সহানুভূতির অভাব দেখা দিচ্ছে, তা রোধ করতে হলে সামাজিক মূল্যবোধকে আবার কেন্দ্রে ফিরিয়ে আনতে হবে। শিশুদের ছোটবেলা থেকেই সত্যবাদিতা, শ্রদ্ধা, সহানুভূতি, দায়িত্ববোধ, ও মানবিকতা শেখাতে হবে। বাবা-মা ও অভিভাবকদের নিজেদের আচরণেও মূল্যবোধের দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে হবে। গণমাধ্যমকে মানবিকতা বৃদ্ধির জন্য ইতিবাচক ভূমিকা পালন করতে হবে। সর্বোপরি, আমাদের প্রত্যেককে নিজের দায়িত্বে মানবিক আচরণ করতে হবে।

শুধু উন্নয়ন নয়, আমরা চাই একটি মানবিক বাংলাদেশ যেখানে মানুষের মধ্যে থাকবে ভালোবাসা, সহানুভূতি ও সম্মানবোধ। এই স্বপ্ন বাস্তবায়ন করতে হলে রাষ্ট্র, সমাজ এবং ব্যক্তিপর্যায়ে সকলকে এগিয়ে আসতে হবে। মনে রাখতে হবে, মানবিক বাংলাদেশ গড়তে হলে আমাদের প্রত্যেককে আগে মানুষ হতে হবে। আমাদের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে যে প্রতিশ্রুতি জনগণকে দেওয়া হয়েছিল, সেখানেই জনগণের স্বপ্ন ও আকাঙ্ক্ষার প্রতিধ্বনি ছিল। পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছিল বাংলাদেশের জনগণের জন্য সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশকে একটি সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্র ঘোষণা করছি। অল্প কথায় কী অপূর্ব সুন্দর এবং তাৎপর্যপূর্ণ এক ঘোষণা!

রাষ্ট্র যেসব সুবিধা তার নাগরিকদের দেওয়ার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ তা সকলের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য হবে, এই হলো সাম্যের সহজ মানে। অর্থাৎ আপনার আর আমার সামাজিক অবস্থান-ধর্ম-বর্ণ-শ্রেণি-পেশা আলাদা হতেই পারে, কিন্তু রাষ্ট্র আমাদের আলাদা চোখে দেখবে

না, বরং রাষ্ট্রের সুবিধাদি পাওয়ার অধিকার আমাদের সমান থাকবে। সামাজিক ন্যায়বিচার মানে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক অধিকারসমূহের সমবণ্টন। আর মানবিক মর্যাদা মানে মানুষ হিসেবে আপনার-আমার সম্পূর্ণ মর্যাদা পাওয়ার অধিকার। মুক্তিযুদ্ধের পর জনগণ বারবার আন্দোলন-সংগ্রামের ভেতর দিয়ে তাদের অধিকার ফিরে পেতে চেয়েছে। নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থান আর চব্বিশের গণঅভ্যুত্থান জনগণের অধিকার আদায়ের সংগ্রামে দুটো মাইলফলক হয়ে থাকবে।

মুক্তিযুদ্ধ আমাদের বাতিঘর, যেকোনো সংকটে মুক্তিযুদ্ধই আমাদের পথ দেখাবে। সুতরাং, এই মুহূর্তের করণীয় হলো, স্বাধীনতার ঘোষণার কাছে ফিরে যাওয়া। মুক্তিযুদ্ধ-স্বাধীনতা-দেশ-রাষ্ট্র এসব কিছুর মালিকানা জনগণকে বুঝিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করে জনগণের জন্য সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করাই এখনকার প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত। একটা কথা মনে রাখা দরকার, সাম্য না থাকলে সমাজের ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যায়। দীর্ঘকালের অপশাসনে আমাদের সমাজের ভারসাম্য নষ্ট হয়ে গেছে। সেজন্যই এত অস্থিরতা চারদিকে, এত বিকার, এত উগ্রতা।

জনগণের অধিকার আদায়ের ক্ষেত্রে গণঅভ্যুত্থান অবশ্যই শক্তিশালী একটি মাধ্যম। আমেরিকান তাত্ত্বিক ভাষাবিজ্ঞানী, শিক্ষাবিদ, দার্শনিক ও সমাজ সমালোচক আভ্রাম নোয়াম চমস্কির ভাষায়, ‘যখন একটি সরকার জনগণের মৌলিক অধিকার ও চাহিদা পূরণে ব্যর্থ হয় তখন গণঅভ্যুত্থান অপরিহার্য হয়ে ওঠে।’ গণঅভ্যুত্থানের প্রক্রিয়া ও ফলাফল সব সময় একইরকম নাও হতে পারে। এর মধ্যদিয়ে জনগণ তার ইচ্ছাশক্তির বহিঃপ্রকাশ ঘটায় এবং ঐক্যবদ্ধভাবে একটি পরিবর্তন আনার সংগ্রামে মিলিত হয়। তবে একটি ইতিবাচক পরিবর্তনের জন্য জনগণের সমর্থনের পাশাপাশি সঠিক নেতৃত্ব অপরিহার্য। অন্যথায় তা প্রায়শই বিশৃঙ্খলা ও অস্থিতিশীলতায় পর্যবসিত হয়। জনসমর্থন হচ্ছে এর শক্তির দিক, দিশাহীনতা হচ্ছে দুর্বলতার দিক।

একটা বিষয় মনে রাখা দরকার তা হলো, প্রজন্ম ও প্রজন্মের দৃষ্টিভঙ্গি কোনো স্থির বিষয় নয়; যুগে-যুগে প্রজন্মের রুচি-রূপ এবং দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টায়। কিন্তু ইতিহাস তার জায়গায় ঠিকই থেকে যায়, থেকে যায় মুক্তির আকাঙ্ক্ষা। তাই ক্ষমতার পরিবর্তনই যথেষ্ট নয়, প্রয়োজন আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক ব্যবস্থার পরিবর্তন। যার মধ্যদিয়ে আমরা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় প্রকৃত অর্থে বৈষম্য নিরসন করে সাম্যের বাংলাদেশ গড়ে তুলতে সক্ষম হবো। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কথা মাথায় রেখে মানবিক রাষ্ট্র গঠনে নতুন দৃষ্টিভঙ্গিরাষ্ট্র

শাহজালাল বিমানবন্দরে ভয়াবহ আগুন, নিয়ন্ত্রণে ২৬ ইউনিট

হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের কার্গো এলাকায় ভয়াবহ আগুনের ঘটনা ঘটেছে। এই আগুন নিয়ন্ত্রণে ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে ফায়ার সার্ভিসের ২৬টি ইউনিট।

শনিবার (১৮ অক্টোবর) দুপুর সোয়া ২টার দিকে আকস্মিকভাবে এ আগুনের সূত্রপাত ঘটে।

ঘটনার পরপরই বিমানবন্দরের ফায়ার সেকশন, বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর ফায়ার ইউনিট এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সংস্থা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে সম্মিলিতভাবে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার কার্যক্রম শুরু করে।

এ অবস্থায় বিমানবন্দরের সব ফ্লাইট অপারেশন বর্তমানে স্বাভাবিক রয়েছে উল্লেখ করে বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ সবাইকে নিরাপদ এবং সচেতন থাকার জন্য অনুরোধ জানিয়েছে।

এদিকে ফায়ার সার্ভিসের ডিউটি অফিসার লিমা খানম জানান, আগুনের খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের মোট ২৬টি ইউনিট ঘটনাস্থলের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছে। তবে সবকটি ইউনিট এখন পৌঁছায়নি, ৯টি ইউনিট কাজ শুরু করেছে।

প্রাথমিকভাবে অগ্নিকাণ্ডের কারণ ও ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ জানাতে পারেননি ফায়ার সার্ভিসের এ কর্মকর্তা।

সূত্র: যুগান্তর।

অ্যানথ্রাক্স সংক্রমণ থেকে

বাঁচতে করণীয়

গ্রিক শব্দ অ্যানথ্রাক্স (Antharx) এর বাংলা তড়কা রোগ এবং আভিধানিক অর্থ কয়লা। এটি ব্যাসিলাস অ্যানথ্রাসিস বা ব্যাসিলাস সেরিয়াাস বায়োভার অ্যানথ্রাসিস ব্যাকটেরিয়া দ্বারা সৃষ্ট একটি সংক্রমণ। ১৮৭৫ সালে জার্মান বিজ্ঞানী রোবের্ট কচ প্রথম অ্যানথ্রাক্স এর অস্তিত্ব সম্পর্কে জানান দেন। তবে তারও পূর্বে ১৭৫২ সালে বিজ্ঞানী মারেট এবং ১৭৬৯ সালে বিজ্ঞানী ফোর্নিয়ার ত্বকের অ্যানথ্রাক্সের প্রথম ক্লিনিকাল বর্ণনা দিয়েছিলেন। এর পূর্বে এটি ছিলো কেবলই ঐতিহাসিক বিবরণ। এ বিরল রোগটি মানুষের ক্ষেত্রে আফ্রিকা এবং মধ্য ও দক্ষিণ এশিয়ায় সব চেয়ে বেশি দেখা যায়। এটি মহাদেশের অন্যান্য স্থানের তুলনায় দক্ষিণ ইউরোপে বেশি দেখা যায়। উত্তর ইউরোপ এবং উত্তর আমেরিকায় এ সংক্রমণ অস্বাভাবিক। বিশ্বব্যাপী বছরে কমপক্ষে দুই হাজার টি সংক্রমণের ঘটনা ঘটে। এ সংক্রমণ সাধারণত ত্বকের সংস্পর্শ, শ্বাস- প্রশ্বাস বা অন্ত্রের শোষণের মাধ্যমে ঘটে। এ রোগে সংক্রমিত হওয়াার একদিন থেকে দুই মাসেরও বেশি সময় পরে লক্ষণগুলি পরিলক্ষিত হয়। ত্বকে একটি ছোটো ফোস্কা দেখা যায় যার চারপাশে ফোলাভাব থাকে; যা প্রায়শই কালো কেন্দ্রবিন্দুসহ ব্যথাহীন আলসারে পরিণত হয়। জ্বর, বুকে ব্যথা এবং শ্বাসকষ্ট এর অন্যতম উপসর্গ। এছাড়াও, এ সংক্রমণে ডায়রিয়া (যার মধ্যে রক্ত থাকতে পারে), পেটে ব্যথা, বমি বমি ভাব এবং বমিও হতে পারে।

প্রাথমিকভাবে, অ্যানথ্রাক্স মূলত ব্যাকটেরিয়া জনিত গবাদি পশুর একটি মারাত্মক সংক্রামক রোগ। এ রোগে আক্রান্ত পশু হঠাৎ করে মারা যায়। এরোগটি গরুর ডাকমিনা, ধাস ও ধড়াস নামেও পরিচিত। সাধারণত ক্ষুরাযুক্তপ্রাণী যেমন- গরু, ছাগল, ভেড়া ও মহিষে এ রোগ ব্যাপকভাবে দেখা যায়। গবাদিপশুতে এ রোগের মৃত্যুর হার শতভাগ। আক্রান্ত বা মৃতপশুর সংস্পর্শে আসা মানুষেরও অ্যানথ্রাক্স হওয়ার সম্ভাবনা সর্বোচ্চ। আতঙ্কের বিষয় হচ্ছে এ রোগের জীবাণু মাটিতে প্রতিকূল পরিবেশে সুপ্ত অবস্থায় ‘স্পোর’ নামক একপ্রকার প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থায় ৪০-৫০ বছর পর্যন্ত বেঁচে থাকতে পারে এবং অনুকূল পরিবেশে সক্রিয় হয়ে গবাদি পশুকে আক্রান্ত করতে পারে। তাই একবার কোথাও দেখা দিলে পরবর্তীতে বারবার সে এলাকায় এ রোগ দেখা দিতে পারে। নিম্ন জলাভূমি, নদীর পাড় ও উপকূলীয় অঞ্চলে এর প্রকট প্রাদূর্ভাব দেখা যায়। সে হিসেবে আমাদের দেশে সাধারণত

সিরাজগঞ্জ,মেহেরপুর, পাবনা,রাজবাড়ি, রাজশাহী ও টাঙ্গাইল জেলায় এ রোগটির প্রাদুর্ভাব বেশি। তবে চলতি বছরে সংক্রমণ দেখা দেয় রংপুরের বিভিন্ন উপজেলায় এবং উপসর্গ নিয়ে মৃত্যুও ঘটে। গণমাধ্যমের বদৌলতে জানা যায় ২০২২ সালের জানুয়ারি থেকে সেপ্টেম্বর সময়ে এ সংক্রমণে ৪৩১ জন আক্রান্ত হয়।

গ্রীষ্মের শুরূ থেকে বর্ষাকাল (মার্চ-সেপ্টেম্বর) পর্যন্ত, খরা মৌসুমের পরে হঠাৎ বৃষ্টিপাত হলে এবং বন্যার পরের সময়ই সাধারণত সংক্রমণের ঝুঁকিপূর্ণ সময়কাল। সংক্রমিত পশু-খাদ্য যেমন- ঘাস, কচুরিপানা ইত্যাদি;অ্যানথ্রাক্স রোগে আক্রান্ত মৃত পশুকে খোলা স্থানে ফেলে রাখলে শকুন, কুকুর, শেয়াল ইত্যাদি শবাহারী প্রাণি; কখনো কখনো মাছি এবং অ্যানথাক্স আক্রান্ত মৃত পশু পঁচে-গলে মাটিতে মিশে গেলে হাড় থেকেও পশুতে এ রোগ ছড়াতে পারে। আক্রান্ত বা মৃত পশুর শ্লেষ্মা, লালা, রক্ত, মাংস, হাড়, চামড়া, পশম বা নাড়ি-ভুঁড়ির সংস্পর্শ, আক্রান্ত পশুর মাংস খাওয়া, পশুর চামড়া এবং অন্যান্য উপজাত (হাড়, দাঁত, শিং ইত্যাদি) প্রক্রিয়াজাতকরণ কাজে যুক্ত থাকার মাধ্যমে সাধারণত মানুষে এটি ছড়ায়। মূলত অ্যনথ্রাক্স আক্রান্ত পশুর মাংস কাটার সময় মানুষের মধ্যে অ্যানথ্রাক্স ছড়ানোর সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি থাকে। পশু জবাই করা, সেটির মাংশ কাটাকাটি করা এবং মাংস ধোয়া বা রান্নার সময় অনেকক্ষণ মাংস, রক্ত ও হান্ডির সংস্পর্কে থাকতে হয়। সে সময় আক্রান্ত পশুর রক্তের মাধ্যমে মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়তে পারে অ্যানথ্রাক্স। মাংস কাটাকাটির সময় মানুষের শরীরের চামড়ায় কোনো রকম ক্ষত থাকলে তার দেহে অ্যানথ্রাক্সের জীবানু প্রবেশ করার সম্ভাবনা বেশি থাকে। আমাদের দেশে পশুর অ্যানথ্রাক্স হলেও অনেক সময় তা জবাই করে মাংস কম দামে বিক্রি করে ফেলা হয়। ঐ মাংস কাটাকাটি করার সময় অ্যানথ্রাক্সে আক্রান্ত হওয়া সম্ভাবনা থাকে। তবে পশু থেকে মানুষের মধ্যে অ্যানথ্রাক্স সংক্রমণ হলেও মানুষ থেকে অন্য মানুষের মধ্যে অ্যানথ্রাক্স সংক্রমণ হয় না।

পশুতে অ্যানথ্রাক্সের লক্ষণগুলো হচ্ছে- আক্রান্ত পশু হঠাৎ করে মারা যাওয়া,নাক, মুখ ও পায়ুসহ শরীরের বিভিন্ন ছিদ্র দিয়ে রক্তক্ষরণ এবং বের হওয়া রক্ত জমাট না বাঁধা,প্রচন্ড জ্বর (প্রায় ৪০-৪২০ সে./১০৪-১০৭০ ফা:),শরীরের লোম খাড়া হয়ে যাওয়া, জাবর কাটা বন্ধ হয়ে যাওয়া, মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকা, মাংস পেশীর কম্পন, প্রাথমিকভাবে অস্তিরতা বা উত্তেজনা কাজ করলেও পরবর্তীতে নিস্তেজ হয়ে যাওয়া, শ্বাসকষ্ট ও দাঁত কটকট করা, খিঁচুনি ও কাঁপুনি,

সাধারণত ২-২৪ ঘন্টার ভেতর মারা যাওয়া এবং এক দিনের বেশি বেঁচে থাকলে শরীরের বিভিন্ন জায়গায় (জিহ্বা, গলা, বুক, নাভি) পানি জমে যাওয়া। পশুর দেহে মৃত্যুর পরবর্তী লক্ষণগুলোর মধ্যে মৃত পশুর পেট অস্বাভাবিকভাবে ফুলে উঠে, নাক, মুখ, প্রসাব ও মলদ্বার দিয়ে আলকাতরার মত কালো রক্ত বের হওয়া, মৃতদেহ শক্ত না হওয়া এবং অতি তাড়াতাড়ি পচন শুরু হওয়া অন্যতম। আর মানুষে অ্যানথ্রাক্স রোগটি সাধারণত তিনটি রূপে দেখা যায়। যথা-ত্বকের অ্যানথ্রাক্স, পরিপাকতন্ত্রের অ্যানথ্রাক্স ও শ্বাসতন্ত্রেও অ্যানথ্রাক্স। এর মধ্যে ত্বকের অ্যানথ্রাক্সই বেশি দেখা যায়। সাধারণত আক্রান্ত পশুর সংস্পর্শে আসার ৩-১০ দিনের মধ্যে এ রোগের উপসর্গ দেখা দেয়। ত্বকের অ্যানথ্রাক্সের সাধারণ লক্ষণগুলো হচ্ছে-প্রথমে চামড়ায় লালচে দাগ হয়, আক্রান্ত স্থান চুলকায় ও ফুলে উঠে, পরবর্তীতে আক্রান্ত স্থানে ১.৫-২ ইঞ্চি আকারের ফোসকা উঠে, ফোসকার মাঝখানে পচনের মত কালচে দাগ হয়ে ব্যথাহীন ঘা এর সৃষ্টি হয়; তবে সাধারণত জ্বর থাকে না।

পশুর ক্ষেত্রে অ্যানথ্রাক্স রোগের চিকিৎসায় প্রাথমিক অবস্থায় দ্বিগুণ মাত্রার পেনিসিলিন জাতীয় এন্টিবায়োটিক ব্যবহার করে উপকার পাওয়া যায়। অতিতীব্র সংক্রমণের ক্ষেত্রে সাধারণত চিকিৎসার সুযোগ থাকে না। মানুষ থেকে মানুষে অ্যানথ্রাক্স ছড়ায়না, কিন্তু মানুষের শরীর এবং পোশাক অ্যানথ্রাক্স জীবাণু বহন করতে পারে। শরীর থেকে জীবাণু দূর করার জন্য ব্যাকটেরিয়া নিরোধক সাবান দিয়ে গোসল এবং গোসলের পানি ব্লিচিং বা কোনও ব্যাকটেরিয়া নিরোধক দ্বারা শোধিত করা এবং জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত জিনিসপত্র ৩০ মিনিটের অধিক সময় ধরে ফুটাতে হবে। কোনো কোনো জায়াগা থেকে জীবাণু ধ্বংসে ক্লোরিন ব্লিচিং কার্যকরী নয়; বরং এক্ষেত্রে ফরমালডিহাইড ব্যবহার করা উচিত। আক্রান্ত বাক্তির কাপড় পুড়িয়ে ফেলা জীবাণু ধ্বংসের একটি কার্যকর পদ্ধতি। মানুষ আক্রান্ত হবার পর যত দ্রুত সম্ভব অ্যানথ্রাক্স জীবাণুনাশক দিতে হবে; যত দেরি হবে জীবনের ঝুঁকি তত বাড়বে। মানুষের জন্য অ্যানথ্রাক্স টিকা প্রথম ১৯৫৪ সালে বাজারে আসে। ত্বকের অ্যানথ্রাক্স সম্পূর্ণ নিরাময়যোগ্য অসুখ। তবে সময়মত চিকিৎসা না করালে মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। সকল সরকারি হাসপাতালে বিনামূল্যে এ রোগের চিকিৎসা করার সুযোগ রয়েছে।

গবাদিপশুকে এ মারাত্মক সংক্রমণ হতে রক্ষা করতে হলে পশু-খাদ্য ভালো করে ধুয়ে খাওয়াতে হবে। রোগ নিয়ন্ত্রণে বর্ষার শুরুতেই সকল

পশুকে নিয়মিত টিকা প্রদান করতে হবে। রোগ দেখা দেওয়ার সাথে সাথে অসুস্থ পশু হতে আলাদা করা, নিকটস্থ প্রাণিসম্পদ অফিসে যোগাযোগ,চিকিৎসকের পরামর্শ মত ব্যবস্থা গ্রহণ, কোনো ক্রমেই অসুস্থ পশু জবাই ও কাটাকাটি না করার প্রতি অবশ্যই জোর দিতে হবে। অসুস্থ পশুর মাংস খাওয়া, বিতরণ ও ফ্রিজে সংরক্ষণ না করা,অসুস্থ পশুর সংস্পর্শে আসা সুস্থ পশুগুলোকে টিকা প্রদান অথবা ৪/৫ দিন কার্যকরী এন্টিবায়োটিক দ্বারা চিকিৎসা করে ১০/১২ দিন পর টিকা দেওয়া,আক্রান্ত এলাকাসহ পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের সকল সুস্থ গবাদি পশুকে তড়কা রোগের টিকা দেওয়া অত্যাবশ্যক।

চিকিৎসকের পরামর্শ মতে, কোনো পশু মারা গেলে কোনো অবস্থাতেই মৃত পশুকে যেখানে- সেখানে ফেলে কিংবা নদীতে ভাসিয়ে বা মুচিকে চামড়া ছাড়াতে দেয়া যাবে না। মৃত পশুকে মাটিতে কমপক্ষে ৬ ফুট গভীর গর্ত করে চুন ছিটিয়ে পুঁতে অথবা পুড়িয়ে ফেলতে হবে। মৃতদেহ সম্ভব হলে মৃত্যুবরণের জায়গাতেই সৎকার করা উচিত; তা না হলে মৃত পশুর দেহের সব স্বাভাবিক ছিদ্রপথ(মুখ, নাক, পায়ু ও যোনিদ্বার) তুলা, কাপড় বা অন্য কিছুদিয়ে বন্ধ করার পর সানান্তর করতে হবে। পাথর ও কাটাযুক্ত জিনিস ব্যবহার করে জায়গাটিঢেকে দিতে হবে যাতে শেয়াল বা কুকুর তা খুজে বের করতে না পারে। অসুস্থ পশুর সকল মলমূত্র, রক্ত ও বিছানাপত্র একইগর্তে ফেলতে হবে বা পুড়িয়ে দিতে হবে। আক্রান্ত স্থানে ব্লিচিং পাউডার বা অন্য কোন জীবাণুনাশক ঔষধ দিয়ে পরিষ্কার করতে হবে এবং সঠিকভাবে মৃত পশুর দেহ পুঁতে ফেলার নির্দেশনার জন্যপ্রয়োজনে নিকটস্থ প্রাণিসম্পদ অফিসে যোগাযোগ করা উচিত।

অ্যানথ্রাক্স রোগের সংক্রমণ রোধে প্রথমেই পশুতে সংক্রমণ রোধ করতে হবে। কারণ পশু থেকেই বিভিন্নভাবে এ সংক্রমণকারী ব্যাকটেরিয়া মানুষে ছড়ায়। গবাদি পশু খামারিদের জন্য চলমান বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে এ সংক্রান্ত সেশনের ব্যবস্থা রাখা, প্রয়োজনে বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা অত্যাবশ্যক। অসুস্থ পশু জবাই এবং জবাইকৃত গরুর মাংস যাতে কোনোভাবেই বাজারজাত করতে না পারে সে জন্য সারাদেশে কসাইখানায় নির্দেশিত চলমান পরিদর্শন কার্যক্রম বেগমান এবং আইনের প্রয়োগের বিকল্প নেই। এ সংক্রমণের ভয়াবহতা অনুসারে সর্বস্তরের অংশীজনদের সমন্বিত প্রস্তুতি বরাবরই অপ্রতুল। সর্বোপরি এ মহামারি আকার ধারণ করার পূর্বেই এ মারাত্মক সংক্রমণ ও মৃত্যু ফাঁদ হতে রক্ষা পেতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ, গবাদিপশু খামারি, কসাই, ভোক্তাদের সমন্বয়ে জনসচেতনতা গড়ে তোলা উচিত।

লেখক: তথ্য অফিসার, জেলা তথ্য অফিস খাগড়াছড়ি